*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 573 - 583*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : প্রসঙ্গ নাট্য উপাদান

নিফাত আলমগীর
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : nifatalamgir9@gmail.com

***Received Date*** *10. 04. 2025*
***Selection Date*** *23. 04. 2025*

***Keyword***
*Ghazir song, Pir literature, Punthi, folk drama, southern region, Dakshina Ray, Ghazi-Kalu-Champavati Punthi, folk life.*

***Abstract***
*A significant genre of ancient folk theater of Bengal is 'Gazir song'. Ghazir song varies from region to region in Bangladesh. Although there is no specific information about the origin of Ghazir song, it can be said that Ghazir song has a close relationship with the Pir literature called Punthi of Ghazi-Kalu-Champavati. It is also known that Ghazi stories are associated with the mythical tiger god Dakshina Ray in Ghazi songs of the southern region. Various elements of thousand-year-old folk drama are hidden in the performance and character of Ghazi songs, which are tried to be highlighted in this article as a reflection of the folk life and spirit of that time.*

## Discussion

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজির গান, গাজির পালা, গাজির গীত, গাজির গাইন, পিরের গান, গাইনের পালা, গাইনের গীত, গাইনের তামাশা ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই গাজির গান বাংলাদেশের গ্রামসমাজের সাধারণ মানুষের লোকসংস্কৃতি সাথে সম্পৃক্ত এবং সংগীত, কথকতা ও অভিনয় সমৃদ্ধ এই লোকনাট্য বাংলাদেশের ফোকলোর সম্পদকে প্রতিনিধিত্ব করে।[১] বাংলাদেশের দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদূর অতীতকাল হতে লোকসংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে লোকনাট্য প্রচলিত হয়ে আসছে। এই লোকনাট্যগুলোর বীজ রোপিত হয়েছিল সেই প্রাচীনকালে লোকসমাজের প্রয়োজনেই। এইসব লোকনাট্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল গাজির গান লোকনাট্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> “লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।”[২]

বিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গাজির গান শিল্প মাধ্যমটি আলোচক-সমালোচকদের নজরে আসে। এরপর থেকেই অনেক আগ্রহী ব্যক্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গাজির গান বা পালা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে শুরু করেন। অতএব এই সব তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, গাজি-কালু-চম্পাবতী বিষয়ক পুথির কাহিনির সাথে গাজির গানের কাহিনির সাদৃশ্যতা থাকলে গাজির গান ও গাজির পুঁথি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের শিল্প।[৩] বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে এমন কিছু গাজির গান পাওয়া যায়, যার কাহিনিতে গাজি-কালু-চম্পাবতীর কাহিনির কোন উপস্থিতি নেই।

গাজির গান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতির অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ শাখা হল লোকনাট্য। যারা এই লোকনাট্যের কর্ণধর বা ধারক ও বাহক, সাধারণ অর্থে তাঁরা আমাদের নিম্নশ্রেণির বা

কৃষিজীবী অর্থাৎ তাঁরা লোকসমাজের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ। সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান : প্রসঙ্গ নাট্য উপাদান বিষয়ক এই আলোচনায় বাংলাদেশের লোকজাতীয় সংস্কৃতির নির্মাণের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তোলার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থাৎ গাজির গানে লোকনাট্যিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র না গৌণ তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া এ প্রবন্ধে গাজি গানের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমটি হল, গাজির গানের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও তৎকালীন লোকসমাজের জীবনধারা। দ্বিতীয়টি হল, সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গানের ঐতিহাসিকতা এবং তৃতীয়টি হল, গাজির গানের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্যে নাট্য উপাদান কিভাবে বিদ্যমান। গাজির গানের নাট্যিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা একারণে প্রয়োজন যে, গাজির গান লৌকিক গান হিসেবে প্রচলিত হলেও এর মধ্যে নাটকের নানা উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই মধ্যযুগের কোনো এক অজ্ঞাত কালপর্ব থেকে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা বাঘের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গাজি পিরের নাম স্মরণ করে আসছে। কালক্রমে এই পিরকে নিয়ে গড়ে ওঠেছে এক নাটকীয় কাহিনি, যা গাজির গানের কথাবস্তু।[৪] গাজির গান সপ্তদশ শতকের বাংলার মুসলমান সমাজে পূজিত গাজি পিরের লৈকিক-অলৌকিক কাহিনি কেন্দ্রিক কৃত্যমূলক 'পীরের পাঁচালী'।[৫] গাজী পীর, সত্যপীর, মানিক পীর, খোঁয়াজ খিজির, বড় পীর, দমের মাজার প্রমুখ পিরের জীবন কাহিনি অবলম্বনে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে জারিগান, ব্রতকথা ও পাঁচালি নির্ভর আখ্যান নির্মিত হয়। হয়তো এদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সময় প্রবলভাবে অস্তিত্বমান ছিল। আবার কেউ কেউ উদ্ভাবিত হন লোকমানসের মাধ্যমে। গাজিকে কেন্দ্র করে রচিত গাজির গান 'পাঞ্চালি' অর্থাৎ তা আসরে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনযোগ্য কাব্য[৬] - একথার প্রমাণও পাওয়া যায়। গাজির জীবনভিত্তিক আখ্যান কাব্যের মুদ্রিত পুঁথি শেখ রহিমকৃত 'গাজি কালু চম্পাবতী' পুঁথিকে কবি স্বয়ং 'গাজীর গীতি', আবার পয়ার পাঁচালি নামে অভিহিত করেছেন।[৭] গাজির জীবনকেন্দ্রিক কিংবা প্রসঙ্গ ভিত্তিক দু' ধরণের কাহিনির সন্ধান মেলে - (ক) গাজিকালু চম্পাবতী পুথির লেখ্যরূপ, (খ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 'মৌখিক আখ্যান', 'জামাল-কামাল', 'আফতাব-মাহতাব', 'দিদার বাদশা' প্রভৃতি পালা।

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজি পিরকে নিয়ে অনেকগুলো পুঁথি রচিত হয়।[৮] গাজি পিরের জনপ্রিয়তার কারণেই মৌখিক সাহিত্যের পাশাপাশি গাজি পিরকে ঘিরে লিখিত পুঁথি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে।

গাজি পির বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথির রচনাকাল ১৭৯৮-৯৯ সাল, যার রচয়িতা খোদা বখশ। সৈয়দ হালুমীর ১৮২৭, আবদুর রহিম ১৮৫৩, খন্দকার মাহমুদ আলী ১৮৭৮, মোহাম্মদ মুন্সী ১৮৯৬ এবং আবদুল গফুর বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুঁথি রচনা করেন বলে জানা যায়।[৯] তবে গাজির গানের মূল কাহিনি মৌখিক রীতির সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও গাজির গান এসব পুঁথির কাহিনিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে। দু'একটি চরিত্রের নামের রদবদল থাকলেও এইসব পুঁথিতে গাজি কালু-চম্পাবতীর কাহিনি মোটামুটি একই। এ থেকে ধারণা করা যায়, পুঁথি সাহিত্যের ছায়াকে অবলম্বন করেই পালার কাহিনি সমূহ রচনা শুরু হয়। এই পালাসমূহ সংখ্যায় যেমন প্রাচুর্যের দাবিদার-বিষয়বস্তুতেও তেমনিই বৈচিত্র্যমুখী। লোকসমাজ তার আপন জীবনের অনুকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে নতুন নতুন পালা ও গাঁথা তৈরি করে এবং এর প্রায় প্রতিটি পালাতেই গাজি পির বা কালুর উপস্থিতি থাকলেও ঘটনা এবং চরিত্রের বিস্তৃতির কারণে এর পালার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

বাংলায় যে সকল পূজ্য পির রয়েছেন তাদের মধ্যে গাজি পিরের প্রভাব ব্যাপকতর।[১০] গাজির গানের প্রচলন ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে সমালোচকগণ অনেকটা নীরব ভূমিকা পালন করেন। তবে গাজির গানের কাহিনিতে যেসব ঐতিহাসিক আবহ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে- মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজির গানের উদ্ভব ঘটেছিল। এই অনুমানের পেছনে হয়তো পর্যাপ্ত যুক্তি আহরণ করা সম্ভব। এর জন্য গাজির কাহিনিতে যে সকল ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক স্থানের নামের উল্লেখ রয়েছে, তাদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা-পর্যালোচনা করার প্রয়োজন।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রথমত, গাজি পিরের প্রাসঙ্গিক সাহিত্যকে পর্যালোচনা করলে আপত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মুসলিম শাসনামলের কোনো এক পর্যায়ে গাজি নামে একজন পির ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল এবং বাঘের দেবতার বিকল্প হিসেবে সমকালীন সমাজে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। যদিও গাজির গানের মাঠ পর্যায়ের এক গবেষণায় উঠে এসেছে - গাজি পিরের বাহক ছিল বাঘ।[১১] লোকপূজ্য পির গাজি দক্ষিনা রায়ের পর্যায়ভুক্ত হয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে পূজো হয়ে ওঠেন।[১২] এই ধারণা থেকে অনেকেই মনে করেন ইতিহাসের কোন একজন ধর্মযোদ্ধা ক্রমে গাজি পিরে পরিণত হয়েছেন বা গাজি পির সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি চরিত্র।

দ্বিতীয়ত, গাজী-কালু-চম্পাবতীর কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়া রয়েছে বলে মনে করেন জনাব জাকারিয়া। এই কাহিনির সূত্র ধরে উক্ত কাহিনিতে সুন্দরবন এবং সেকেন্দার শাহ এই দুটি উপসর্গকে তুলনা করলে, তাঁর এই প্রস্তাবনার পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করেন স্বরোচিষ সরকার।

**সুন্দরবন :** এই প্রসঙ্গে মনে রাখার দরকার যে, বাংলাদেশে মুসলিম শাসনামলের সময় অধিকাংশ অঞ্চলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই সময় অনেক পিরই তাদের সঙ্গীদের নিয়ে এইসব বনজঙ্গলে আবাদ করেছিল। আর এ কারণেই তাদেরকে বলা হত 'আবাদি পির'। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর ভারত থেকে আগত এসব পিরদের নিকট বাংলাদেশের সব বনাঞ্চলই সুন্দরবন বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুন্দরবনের তৎকালীন বৃহত্তম সীমানার কথা বাদ দিয়েও সে কথা বলা যায়। তাছাড়া বাঘের উৎপাতও তৎকালীন বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কমবেশি ছিল। আর তাই বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শুধু সুন্দরবন নিকটবর্তী অঞ্চলেই নয়, বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই ছিল। বাঘ-পির সম্পর্কিত প্রথম কাহিনি 'রায়মঙ্গল' রচিত হয়েছিল চব্বিশ পরগনায়, এই প্রসঙ্গে সেটিও বিবেচনা করার মতো। এছাড়া গাজি পিরকে নিয়ে লেখা যেসব পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রাচীনতর পুঁথিগুলো পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে, অর্বাচীনতর কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও চব্বিশ পরগনায়। আর প্রাচীনতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিটি রচিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের লেখক দ্বারা। তৎকালীন সুন্দরবনের নিকটবর্তী জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনাতে তেমন কোন বিখ্যাত পুঁথি লেখকদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের এই অঞ্চলগুলোই সুন্দরবনের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল। তাই গাজির গানে উল্লেখিত সুন্দরবন কতোটা বর্তমান সুন্দরবনকে প্রতিনিধিত্ব করে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়াটা নিশ্চয়ই অবান্তর নয়।[১৩]

**শাহ সেকান্দর :** ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গৌড়ের সুলতান শাহ সেকেন্দারের (১৩৫৫-১৩৯২) খ্রি: বহু পুত্রের মধ্যে একমাত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহই (১৩৯৩-১৪১১) খ্রি: জীবিত ছিলেন। যিনি বিশ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আর সেকেন্দার শাহ রাজত্ব করেন পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি আদিনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ। গিয়াসউদ্দীন আজম সাহের তাঁর পিতা সুলতান সেকেন্দার সাহের সাথে মতপার্থক্য তৈরি হলে তিনি রাজধানী ত্যাগ করেন, স্বরোচিষ সরকারের মতে এই কাহিনির সঙ্গে তুলনা করা যায় গাজির তাঁর পিতার সাথে দ্বন্দ্ব ও বনবাসের কাহিনিকে।

গৌড়ের ক্ষমতা দখলের আগে গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁ থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন, বৃহত্তর ঢাকা থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত এই দীর্ঘ এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে নিশ্চয়ই অনেক সময় প্রয়োজন হয়েছিল। গিয়াসউদ্দীনের এই অসাধারণ বীরত্বের পাশাপাশি তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও সকল ঐতিহাসিকগণ একমত। গিয়াসউদ্দীন সাহের তত্ত্বাবোধনে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটে, এমনকি তাঁর অসমাপ্ত কবিতাও একজন ফরাসি কবি হাফিজই সমাপ্ত করেন। অবশ্য তাকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ তিনিই করেছিলেন।[১৪] ইতিহাস থেকে জানা যায়, গিয়াসউদ্দীন আজম বিহারের পির মুজফ্ফর শামস বলখি এবং তাঁর বাল্যবন্ধু পির কুতুব-ই-আলমের মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং অনুমান করা হয়, তাদেরই পরামর্শে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করেছিলেন। এছাড়া তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সুফি ও পিরগণ ধর্ম প্রচারের প্রসার ঘটান বলে জানা যায়।[১৫] এই সুলতানই দুই-এক শতাব্দীর ব্যবধানে সাধারণ পির ভক্ত মানুষের কাছে মিথতুল্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে যা অসম্ভব কিছু নয়। ইলিয়াস শাহের পতনের পর হিন্দু রাজা গণেশ গৌড় অধিকার করেন এবং এই সময় স্থানীয় পিরদের মধ্যে হতাশা ও সংশয় জন্ম

নেয় এবং এরপরেই তারা নতুন ভাবে দীক্ষিত মুসলমানদের নিকট তাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখার প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টাকে আরো উসকে দেন গণেশের পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন। ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে যে তাঁর উৎসাহ ছিল তার সর্বজনবিদিত। এজন্য অনেকেই মনে করেন, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজেও মধ্যে মিশে আছেন।[১৬] তাছাড়া তাঁর বন্ধু পির কুতুব-ই-আলমও কিভাবে কালু পিরের সঙ্গে মিশে আছেন। এ বিষয়ে প্রাচীনতম পুঁথির লেখক খোদা বখশ এর কালু সম্পর্কিত পুঁথির একটি অংশ উল্লেখ করলে আমাদের অনুমান করতে সুবিধা হবে। কালুর পরিচয় দিয়ে খোদা বখশ লেখেন -

"বাদশার পালকপুত্র কালু হাজেরা।
পাঁচশত উমরা মধ্যে প্রধান উমরা।
গাযীর সহিতে তার অনেক পেয়ার।
গাযী আর কালু দুহে একই ইয়ার।"[১৭]

উল্লেখিত পুঁথির অন্যতম আমির ও ইয়ার 'কালু' পরবর্তী পুঁথিগুলোকে শুধু ভাতৃপরিচয় পরিচয় ধারণ করে। আর এ কারণেই হয়তো সেসব পুঁথিগুলো থেকে কালুকে সহজে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে গাজির মধ্যে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহকে যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনি কালুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় পির কুতুব-ই-আলমকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে গাজির গানের উদ্ভব সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, এক. নতুনভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে গাজিমঙ্গল কাব্যের জন্ম হয়েছিল। মঙ্গল গানের মতো তা প্রথমে পাঁচালি গান হয়ে লোকনাট্যে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছিল এবং এ থেকে গণ্য করা যায় যে, গাজি গানের উৎস ছিল গাজি বিষয়ক পুঁথিগুলো। অর্থাৎ প্রথমে জন্ম হয়েছিল গাজি বিষয়ক পুঁথির এবং এই পুঁথি পাঠ ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া ক্রমবিকশিত হতে হতে জন্ম হয়েছিল গাজির গানের। দুই. গাজির গানের উপর ভিত্তি করেই গাজ বিষয়ক পুঁথিগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। তাতে গাজির গানের উদ্ভব পনের শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা সম্ভব।[১৮]

উপরিক্ত আলোচনা থেকে মীমাংসায় আসা কঠিন যে - গাজির গান না গাজি বিষয়ক পুঁথি? কে কার থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল? তবে তর্কে না গিয়ে উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে মেনে নেওয়াই অধিকতর যৌক্তিক।

গাজির গান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। গাজির গানের পরিবেশন রীতিতেও রয়েছে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা, গাজির গানের দলে মোটামুটি ৮/৯ জন লোক লাগে। গাজির গান যারা পরিবেশন করে থাকেন, তাঁদের আঞ্চলিক নাম গায়ান, গায়েন বা গাইন।[১৯] এর মধ্যে একজন থাকেন মূল গায়েন আর মূল গায়েনের সহযোগী এক ধরনের গায়েন থাকে, যাদেরকে 'তাতাইরা গাইন' বলে।[২০] গায়েনদের সহযোগিতার জন্য থাকেন কয়েকজন দোহার, যারা প্রয়োজনে অভিনয় করেন, আবার কখনো কখনো গানের ধুয়ার অংশে অংশগ্রহণ করেন। কয়েকজন থাকেন যন্ত্রী, যারা হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল বা মৃদঙ্গ, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজান। কোনো কোনো অঞ্চলে নৃত্য পরিবেশনের জন্য অল্পবয়স্ক ছেলেদের নারী সাজে সাজানো হয়ে থাকে।

অঞ্চলভেদে গায়েনদের পোশাকেরও ভিন্নতা পাওয়া যায়। আবদুল হক চৌধুরীর বর্ণনায় জানা যায়, বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গায়েনদের পোশাক ছিল রঙিন পাজামা ও সাথে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢিলে-ঢোলা আচকান। আচকানের পিঠে ও আস্তিনের উপরের লালসালুতে কাপড়ের তৈরি হরতন, রুইতনের টিক্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতির নকশা থাকতো। মাথায় থাকতো পাগড়ী, হাতে থাকতো চামর।[২১] বিংশ শতকের শেষ দিকে ঢাকা, ফরিদপুর অঞ্চলের গায়েনদের পোশাক ও পরিবেশনরীতি ছিল কিছুটা আলাদা। এই অঞ্চলের মূল গায়েন পাঞ্জাবি, ধুতি ও কালো টুপি বা পাগড়ি পড়ত, গলায় তসবি ও হাতে থাকতো চামর, যা চমরি গাইয়ের লেজ দিয়ে তৈরি করা হত যা রাজকীয় পাখা হিসেবে বহুকাল ধরে জনপ্রিয় ছিল। আব্দুল হক চৌধুরী গাজির গানের পরিবেশন রীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বিল পাহাড়ের ফাঁকা জায়গায় গাজির গানের আসর বসত। গাজির গানের আসর তৈরি হত ৪×৪ গজ পরিমিত স্থানে। এর চারি কোণে চারটি বাসের 'ঠুনি' পোতা হত। ঠুনির উপরে 'ধাইর্যার' (তলই) চাউনি দেওয়া বা সামিয়ানা টাঙ্গানো হত। আসরের নিচে পাটি বিছিয়ে দেওয়ার পর গাজির পালার গায়েন এসে উত্তর দিকের দুই খুটির মধ্যখানে মাথায় অর্ধবলয় শোভিত আনুমানিক

সাড়ে চার ফুট লম্বা ও এক ইঞ্চি বেড়ের একটি লৌহদণ্ড গেঁড়ে পুতে দিতো। এটা গাজির 'আষা' (লাঠি)। এর গোড়ায় একখানি কুলায় রাখা হতো দু'সের চাউল, আম্র-পল্লব প্রভৃতি দ্রব্য। আর খুলনাঞ্চলে চালের উপর রাখা হত মিষ্টান্ন বা চিনি, আলু, ধূপদানি, আগরবাতি, সিঁদুরের কৌটা, চামর প্রভৃতি। পাশে রাখা হত আমপাতার ঘট। ঘটে জল রাখা হত এবং সবুজ কচি পাতার পল্লব স্থাপন করা হয়। এগুলি গাজির নামে শিরণি দেবার নাম করে গায়েন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে চেয়ে নিতো। এটা সম্ভবত গাজির গানের সুপ্রাচীন রীতির স্মারকরূপে করা হত। গায়েনের দোহারী ও বাইন আসরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশের বসতো তাদের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। আসরের চতুর্দিকে বসতো শ্রোতারা।[২২]

দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র ভূমিকায় গাজির গানের আসরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-

> "আসলে চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা; ...উত্তর দিকের মাঝামাঝি একটা লোহার খুঁটি, মাথায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহ বলায় ধারণ করিয়া ভূপ্রোথিত ছিল। ...নিচে একখানি কুলায় চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সাজানো ছিল। সেগুলি গাজির সিন্নি। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির চাষী সম্প্রদায়ই এই সিন্নি মানত করিয়া বাড়িতে গাজির গীতি দিয়া থাকে।"

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে এই নাটক যেকোনো খোলা জায়গায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন - বাড়ির বাইরে, উঠানে, বাগান বাড়ি, স্কুল মাঠ, হাটের খোলা জায়গায়, সমতল ভূমিতে এই নাট্যের আয়োজন করা হয়। মোটামুটি ৮ ফুট থেকে ১২ ফুট ব্যাস যুক্ত গোলাকার অংশে অভিনয় - বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। আবার কোথাও কোথাও ১০'×১০' আকৃতির বর্গাকার আয়তক্ষেত্র আসররূপে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এর চারিদিক ঘিরে দর্শকেরা মাটিতে বসে। চার কোনায় চারটি বাঁশের খুটির উপর সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়। অধিক শীত বা বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে টিন দিয়েও ছাপড়া (ছাদ) তৈরি করা হয়ে থাকে। শিশু বা কিশোরদের সামনের দিকে, নারীদের অবস্থান থেকে সাধারণত পিছন দিকে ঘরের বারান্দায় বা ঘর সংলগ্ন এলাকায়, আর কখনো কখনো এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য চেয়ার ও বেঞ্চের ব্যবস্থা থাকে। আসরস্থানে চট বা পাটি বিছানো হয়।[২৩] গাজির গানের মূল গায়েন এবং তাঁর সহযোগীগণ কখনো গানের মাধ্যমে, কখনো পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে, কখনো গদ্য ভাষায় বর্ণনা করে। এই বর্ণনায় একধরনের অভিনয়ের কৌশল ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণত নাট্যভিনয় থেকে আলাদা। মূল গাইনকেই প্রধান কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সহযোগী গায়েন হিসেবে যিনি থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রায় তিনিই গাজীর কালুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহযোগী গায়েন এবং দোহারদের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তবে কালুর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হন, স্বভাবতই অন্য দোহারদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। দোহারগণ শুধু সঙ্গীত সহযোগীই নয়, প্রায় সকল দোহারকেই কোনো না কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। যন্ত্রী ও ছোকরা হিসেবে যারা কাজ করেন, আপাতত দৃষ্টিতে কাজ নির্ধারিত মনে হলেও, গাজির গানের পুরো দলটিকেই গান ও অভিনয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[২৪]

গাজির গান পরিবেশনের সময়কাল মোটামুটি এর দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে। তবে একটি পালাগান শেষ হতে মোটামুটি তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। মো. জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর *দক্ষিণবঙ্গে ঐতিহাসিক লোকনাট্য : গাজীর গান* গ্রন্থে গাজির গানের পরিবেশনা কাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন -

ক. আখ্যান- পূর্ব পর্ব
খ. আখ্যান -পর্ব
গ. অন্তপর্ব বা সমাপ্তি পর্ব

আখ্যান পূর্ব পর্ব শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। এই বন্দনা হয় দশ মিনিট মতো। যন্ত্রসংগীত সহযোগে এই বন্দনাকে কোনো কোনো অঞ্চলে ধুম্বাইল বলে। আখ্যান পূর্ব পর্বের এই ধুম্বাইলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - দর্শকদের আসরের প্রতি মনোনিবেশ করানো। এই সময় মূল অভিনেতা অর্থাৎ গাজি তিনবার মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন এবং পূজা সম্পন্ন করেন। মূল গায়েন বা অভিনেতাগন আল্লাহর প্রতি ভক্তিস্থাপন করে বন্দনা গীতি শুরু করেন।

প্রথমে একজন গায়েন সূচনা করেন আর সাথে সাথে দোহারগন তার পুনরাবৃত্তি করে এবং এরই সাথে সাথে সুর ঝংকারে গোটা পরিবেশ মুখরিত করে তোলেন। গাজির আসর বন্দনা করেন গাজি নিজেই -

"আ...আ...আ...
একি মাগো বাঘের দেবী
আমার কণ্ঠে কর ভর
ওগো বসিতে আছল দেব মাগো
গাছত নাড়ু পড়ে
তোমার গান, তোমার বাদ্য মাগো
উপলক্ষ আমি...
এ সভা মাঝে গান ভাঙ্গিলে মাগো
লজ্জা পাবে তুমি।"[২৫]

গাজির গানের দুই ধরনের বন্দনা রয়েছে। যথা -

১. গাজির জীবনের বন্দনা
২. গাজি সাধন মরগের বন্দনা

মূল আখ্যান ভাগে গাজির গানের অভিনেতাগন বন্দনাকে কখনো বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো বর্ণনাত্মক গীতে, আবার কখনো কাব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করে থাকেন, আবার কখনো কখনো সংলাপের মাধ্যমে অভিনয়ও করেন। দুটি পরস্পর দৃশ্য বা ঘটনার সংযোগ স্থাপনের জন্য বর্ণনাত্মক গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মূল অভিনেতা বা গায়েন গদ্যে ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্র তৈরি করেন। বর্ণনাত্মক গদ্যভিনয়ের মাধ্যমে মূল গায়েন ঘটনার বা কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন এবং বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে কাহিনির যে সব অংশে সমস্যার সৃষ্টি হয় সে সব অংশে মূল গায়েন বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে রস সৃষ্টিপূর্বক সমস্যার সমাধান করেন। সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে মূলগায়েন স্থান, চরিত্র ও ঘটনার পরিবর্তন ঘটান।

অন্ত বা সমাপ্তি পর্বে গায়েন বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পালা সমাপ্ত করে থাকেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ, রসুল ও গাজির গুণকীর্তন করে দলের সকল অভিনেতার পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে পালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সমাপ্তি সূচক বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশনা শেষ করা হয়।

**মূল গায়েন –**

"ওস্তাদ আমার আলীমুদ্দিন বিশ্বাস গো
ওই তার নারকেল বাড়িয়ার বাড়ি।
হাজার হাজার পাক সালাম জানাই গো
ও সালাম জানায় যে তার পায়
এই আসরে কালানাচ করছে মো. দুলাল নাম
রবিউল, পিটু সুলতান এই আসরে ছুকরিগে
হারমোনিয়াম বাজায় নায়েব আলী
সাইদুর রহমান বাজায় ঢোল
সাইদুর রহমান বাজায় ঢোল
আর হাফিস বাজায় বাঁশি গো
ও দল মালিক হয় তোয়াজ উদ্দিন মন্ডল গো
ও যিনার দুধসর গিরাম বাড়ি গো,
ও নিজের নামটি রওশন আলী বয়াতী গো
ও আমার দুর্ধসর গিরাম বাড়ী গো।"[২৬]

এখন প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গাজির গান ও গাজির বিষয়ক পুঁথি দুটিই সম্পূর্ণ আলাদা শিল্পমাধ্যম।[২৭] পুঁথিগুলো একাধিক নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত এক ধরনের কাব্য। পৃথকভাবে সেগুলোর শিল্পমূল্য আছে। উপরিক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, গাজির বিষয়ক পুঁথির সঙ্গে গাজির গানের কাহিনির সম্পর্ক থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে আলাদা এক ধরনের শিল্পমাধ্যম। গাজির বিষয়ক পুঁথির লিখিত পান্ডুলিপি থাকলেও গাজির গানের কোনো প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নেই এবং গাজির গান উপস্থাপন করার সময় সেই পান্ডুলিপিও নানাভাবে বদলে যায়। পরম্পরাক্রমে গায়েনদের স্মৃতিই সবচেয়ে বিশ্বস্ত পান্ডুলিপি হিসেবে কাজ করে।

সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাযী, মোবারক বা মোবরা গাযী, কালুপীর, বনবিবি প্রভৃতির লৌকিক পির-দেবতাকে ব্যাঘ্র-দেবতা রূপে পূজা করার প্রথা দেখা যায়। আগেকার দিনে বনাঞ্চলে কাঠ, মোম, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পূর্বে এইসব দেবতাদের পূজা করে যাওয়ার প্রথা চালু ছিল। সেই প্রথার প্রচলন এখনও কম-বেশি আছে বলে জানা যায়। যেমন - সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় এবং তাঁর পরবর্তীকালে ব্যাঘ্রকুলের অধিপতি বলে মুসলিম গাজি পির এখনও এই অঞ্চলের জনমানসে মোটামুটি অস্তিত্বশীল। ব্যাঘ্রপূজা সম্বন্ধে নীহার রঞ্জন রায় বলেন –

> “আদিম বাঙালির সর্প ও ব্যাঘ্রভীতি সুবিদিত এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় দেখাইয়া কি করিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিয়াছিল এখন আর অবিদিত নয়।মধ্যযুগে মনসা পূজা এবং দক্ষিণ রায় বা ব্যাঘ্রপূজার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই।”[২৮]

সে সময় মানুষের প্রকৃতির সাথে লড়াই করার সামর্থ্য ছিল না, তাই যার কাছ থেকে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের আশঙ্কা থাকতো, তার কাছে নতি স্বীকার করে পূজা দিয়ে তুষ্ট করে ভয়, বিপদ বা অকল্যাণের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রচেষ্টা করত। অরণ্য বা অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে প্রতিনিয়ত হিংস্র প্রাণী বিশেষ করে বাঘের সংস্পর্শে আসতে হত। যেহেতু তাদের বধ বা বশীভূত করা কিংবা ভয় দেখানোর শক্তি তখনকার মানুষদের ছিল না। তাই পূজা দিয়ে তুষ্ট করে অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করত।

প্রাচীন আর্য সমাজের পশুরা সরাসরি মানুষের কাছ থেকে পূজা পেত না। আর্য ও অনার্য ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে বহু অনার্য দেবদেবী ব্রাহ্মণ ধর্মে স্থান করে নিলে তাঁদের সঙ্গে ইতর প্রাণীদের অনেকেই বিভিন্ন অনার্য এমনকি আর্য দেবদেবীর বাহনরূপে পূজার নৈবেদ্যের অংশীদার হয়ে পড়ে এবং সিংহ থেকে শুরু করে পেঁচাও পর্যন্ত দেব-দেবীর বাহক হবার কৃতিত্ব লাভ করে। কিন্তু কোনো দেবদেবীর বাহক না হয়েও ব্যাঘ্র পূজার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত বাঙালির কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে কোনো কোনো অরণ্যাঞ্চলে দেখা যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে এ ধরনের ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন ছিল। ধারণা করা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের প্রাচীন দক্ষিণ রায়ই খুব সম্ভব পরবর্তীকালে বা পরিবর্তিত রূপে উত্তরবঙ্গে ও ময়মনসিংহ জেলায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সেখান থেকেই বড়খাঁ গাজির ঐতিহ্যও মিশে গিয়েছিল।[২৯]

সুন্দরবন অঞ্চলে মোম, মধু, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং অরণ্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের কারণে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যাঘ্রপূজার প্রচলন হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। খুব সম্ভব আদিম মানুষের কালে প্রচলিত বারা মুন্ডকেই ব্যাঘ্র দেবতার প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল এককালে।[৩০] তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার বেশ আগে থেকেই বারা মুন্ড পূজার প্রচলন ছিল যদিও দক্ষিণ রায়ের ‘রায় অভিধাটুকু’ মুসলিম আমলে সংযোজিত হয়েছিল।

মোটকথা, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ব্যাঘ্র পূজার প্রচলন হয়েছিল। সাধারণত মৌল্যা, মঙ্গলী, বাগদী, কাঠুরিয়া, শিকারী, বুনো, পাটনি, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণির হিন্দু যারা কার্যোপলক্ষে সুন্দরবনে যাতায়াত করতেন অথবা বনাঞ্চলের কাছে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যেই ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন প্রথম ঘটে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলমানদের নিম্নবঙ্গ অধিকার ও পির-দরবেশগণ কর্তৃক সেখানে ইসলাম প্রচারের সময় কোনো বিশিষ্ট অমুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কোনো মুসলিম ধর্ম যোদ্ধার প্রবল সংঘর্ষ হয় এবং সেই অমুসলিম নেতা যিনি স্থানীয় হিন্দুদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেন তিনি হচ্ছেন আলোচ্য দক্ষিণ রায়। তাঁদের মতে, তিনি একজন পুরোপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য পরবর্তীকালে লৌকিক দেবতাতে পরিণত হয়েছেন। আবার কেউ বলেন, - ‘দক্ষিণরায় সুন্দরবনের একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর ধনুর্বাণে শিকার

করেন, তাঁহার চরিত্র দেবত্বে পরিণত হয়।' তাকে যশোহর অঞ্চলের তথাকথিত মুকুট সেনাপতি রূপেও পরিচয় করা হয়। এক্ষেত্রে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন –

"অবশ্য এ সকল কাহিনির মূলে কোন সত্য নাই।"[৩১]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের এই উক্তি বড়খাঁ গাজির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নিম্নবঙ্গে তুর্কি অধিকার প্রতিষ্ঠার পর অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বহিরাগত মুসলিম হলেও অধিকাংশই ছিলেন এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিম। ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে অতীতের সংস্কারকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে তারা যে পূজার্চনা করে এসেছিল নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে সেটাকে ছেড়ে দেওয়ার মতো সাহসও তাদের হয়নি। অতএব শ্যাম ও কুল উভয়কে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে একটি বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল, এই বিকল্প ব্যবস্থার নামই হচ্ছে আলোচ্য গাজি কাহিনির নায়ক বড়খাঁ গাজি বা গাজি পির।

আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, এই গাজি পিরই হচ্ছে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণা রায়ের মুসলিম সংস্করণ। তিনি ভাগ্য দেবতা নন বরং দেবতার ধারণায় ইসলামের প্রতিপন্থী। সে কারণে তিনি ব্যঘ্রকুলের পির ও বনের বাঘ তাঁর একান্ত অনুগত সেবক। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতাকে পূজা দেওয়া যায়। কিন্তু মুসলিম গাজি পিরকে পূজা দেওয়া চলে না। অতএব তাঁর জন্য 'শিরনি' ব্যবস্থা করা হল, এও এক রকম পূজা। ভক্তি ও বিশ্বাসের থেকে মানুষ এটা করত। সেই সাথে গাজি পিরকে সন্তুষ্ট করতে বন্দনা গীতেরও আয়োজন করত। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে, সন্তানলাভ, রোগব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বাসনা, বিপদ-আপদ, ফসল হীনতা, মনোকামনা পূর্ণতার প্রভৃতি জন্য তারা গাজি পিরের কাছে মানত করতো এবং এই মানত পূর্ণ হলে গাজি পিরের অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে গাজির বন্দনামূলক গানের আয়োজন করত[৩২], যা থেকে গাজির গানের উৎপত্তি।

গাজির গান মধ্যযুগের পির পাঁচালি রীতির একটি রূপ। বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের মূলে যেসব লোকনাট্য রীতির অবদান রয়েছে, তার মধ্যে 'গাজির গান' অন্যতম। শুধুমাত্র আঙ্গিক নয়, মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় 'গাজির গান'-এর পরিবেশনায়ও উঠে এসেছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য-সমাজ-সময় ও মিথ। 'গাজির গান' কৃত্যের অনুসঙ্গে পরিবেশিত হলেও সময়ের সাথে ধর্মীয় ভেদের পরিকাঠামো ছাড়িয়ে তা হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদয়িক নাট্যরূপ।

মধ্যযুগের মুসলমান মানসে গাজির বসবাস হলেও শিল্পের বিচারে গাজির গান প্রাচীন বাংলার পাঁচালি রীতির দ্বিতাদ্বৈতবাদী উত্তরাধিকার।[৩৩] 'বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি' যার প্রাণধর্ম। এই রীতিতে কাহিনির বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গায়েন বা দোহার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আধুনিককালে অভিনয়ের এই কৌশলকেই বলা হয় 'বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি'।[৩৪] বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতি একের মধ্যে বহু আবার বহুর মধ্যে একের উপস্থাপনা। গাজির গানের শিল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণের পূর্বে বাংলা নাটকের বিবর্তন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তাহলেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো গাজির গানের শিল্পে কতটা নাট্য উপাদান বিদ্যমান –

প্রাচীনকালে নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। প্রাচীন গ্রীকে গ্রীক দেবতা Dianysus এর পূজা পদ্ধতি ছিল Cathersis। Cathersis পূজা পদ্ধতি ছিল সংগীত সহযোগে বুক চাপড়ে কান্না বা হাহাকারের মাধ্যমে বিগত বছরের শোক, গ্লানি, খরা, ফসলহীনতা, বিপদমুক্তির কামনা, সমস্ত না পাওয়াকে দেবতার চরণে সমর্পণ করা, যেন তা পরবর্তী বছরে আর ফিরে না আসে। যা থেকে ট্রাজেডির উৎপত্তি। আবার Dianysus এর পূজা উৎসবে হাস্য পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সংগীত (phallic song) এর প্রচলন ছিল, যা থেকে কমেডির সৃষ্টি।[৩৫] এখানে গ্রিক নাটকের উৎপত্তি উৎস Dianysus এর পূজা পদ্ধতিতে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, এক. এই পূজার উদ্দেশ্য হল বিগত বছরের না পাওয়া, বিপদমুক্তির কামনা, শোক, গ্লানিকে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, দুই. বিনোদন লাভ।

গাজির গানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পির গাজিও লোকায়ত সমাজে সর্ব বিপদ ভঞ্জক পির।[৩৬] বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, যাদের সন্তান আছে তাদের সন্তানের মঙ্গল কামনা, আত্মীয়স্বজনের রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, বিয়ে, ফসল ওঠা, উন্নতি,

অবনতি, উদ্দেশ্য পূরণার্থে গাজির গানের মানত করা হত। এখানেও ক্যাথারসিস পূজা পদ্ধতির দুটি উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে খুলনা অঞ্চলের গাজির গানের শিল্পী মাহাতাব শিকদার বলেন -

> "গাজীর গান মূলত দুইটি উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়। প্রথমত, মানুষের উদ্দেশ্যে, মানতের উদ্দেশ্যে বলতে মানুষ যখন কোন বিপদে পরে, অসুস্থ হয়ে পরে, বিবাহ না, সন্তান হয় না তখন গাজীর গানের মানত করেন। দ্বিতীয়ত, আনন্দদানের উদ্দেশ্য।"[৩৭]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গাজির গানের শৈল্পিকতায় কিছুটা পার্থক্য ও স্বাতন্ত্রতা থাকলেও এই শিল্পে নাটকের সকল উপাদানই বিদ্যমান। শুধু মনোরঞ্জন বা চিত্তবিনোদনেই কেবল নয়, নীতিশিক্ষা ও সমাজচেতনার ক্ষেত্রে লোকজীবনে গাজির গান লোকনাট্যের আবেদন সুগভীর ও সুবিস্তৃত।

একসময় বাংলার গ্রামীণ সমাজে গাজির গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। নগরায়ণ, আধুনিক বিনোদনের প্রসার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে এই লোকসংগীতের প্রচলন কমে এসেছে। তবে কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং লোকসংস্কৃতি গবেষক এটি সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমে বিনোদনের প্রসারের ফলে তরুণ প্রজন্ম লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহী কম। গ্রামাঞ্চলে আগের মতো সাংস্কৃতিক আসর বা যাত্রাপালার আয়োজন কমে গেছে, যা গাজির গানের প্রচলনেও প্রভাব ফেলেছে। গাজির গান মূলত হিন্দু-মুসলিম মিশ্র সংস্কৃতির ফসল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজন বেড়ে যাওয়ায় অনেক স্থানে এটির তেমন জনপ্রিয়তা নেই। গাজির গান পরিবেশনকারী লোকশিল্পীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, কারণ এটি থেকে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আজকের ডিজিটাল যুগে যদিও আধুনিক গান ও বিনোদনের প্রচলন বেশি, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী লোকগান মানুষকে শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করে। লোকগান নতুন ভাবে পরিবেশন করা হলে এটি তরুণদের কাছেও আকর্ষণীয় হতে উঠতে পারে। বর্তমান সময়ে গাজির গানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। গাজি পীরকে বলা হয় বনের রক্ষক। তাঁর কাহিনিতে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে এই বার্তাটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। এটি শুধু একটি ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত নয়, বরং সমাজ, সংস্কৃতি, ন্যায়বিচার, সম্প্রীতি ও পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তাই এটিকে আধুনিকায়ন করে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির এই মূল্যবান সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারবে।

## Reference:

১. আসগর, সৈকত, বাংলার লোকঐতিহ্য : লোকনাট্য, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৮

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড), এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬২৮

৩. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১১

৪. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১২

৫. আল দীন, সেলিম, মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৬), পৃ. ৩২৬

৬. তদেব, পৃ. ৩৪২

৭. আহমদ, আফসার, গাজীর গান: শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, আগস্ট, ১৯৯৮), পৃ. ২

৮. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১২

৯. তদেব, পৃ. ১১২
১০. কবি শামস্, শাহরিয়ার, পীর পাঁচালি ধারার নাট্য: বাগেরহাট জেলার গাজীর গান, (ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর, ২০১৭), পৃ. ২৬
১১. তদেব, পৃ. ২৬
১২. ইসলাম, মো. আমিরুল, সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান -একটি সমীক্ষা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ২
১৩. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৪
১৪. খান, কে এস রাইসউদ্দিন, বাংলাদেশ: ইতিহাস পরিক্রমা, চতুর্থ সংস্করণ, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬-২৭
১৫. করিম, আব্দুল, বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ২২৮
১৬. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১২৫
১৭. মোহাম্মদ, যাকারিয়া আবুল কালাম, বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৩৮৫
১৮. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান: শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১২৬
১৯. রিয়াজুল, হক খন্দকার, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন: ৬৬, গাজীর গান, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৫), পৃ. ৮০
২০. তদেব, পৃ. ৮০
২১. রিয়াজুল, হক খন্দকার, বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন : ৬৬, গাজীর গান, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ১৯৯৫), পৃ. ৬৫
২২. তদেব, পৃ. ৬৫
২৩. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৩৮
২৪. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৬
২৫. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৪১
২৬. তদেব, পৃ. ৫৭
২৭. সরকার, স্বরোচিষ, লোকনাট্য গাজির গান : শৈল্পিক সাতন্ত্র্য ও প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, আইবিএস জার্নাল, ১২শ সংখ্যা ১৪১১ (২০০৫), পৃ. ১১৬
২৮. মোহাম্মদ, যাকারিয়া আবুল কালাম, বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৬৫
২৯. তদেব, পৃ. ৬৬
৩০. তদেব, পৃ. ৬৯
৩১. তদেব, পৃ. ৬৯

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 65*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 573 - 583*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

৩২. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য: গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৬০

৩৩. আহমদ, আফসার, গাজীর গান : শিল্পরীতি, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, আগস্ট, ১৯৯৮), পৃ. ৩

৩৪. আল দীন, সেলিম, মধ্যযুগের বাঙলা নাটক, প্রথম প্রকাশ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৬), পৃ. ৮৮

৩৫. ঘোষ, অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্কারণ, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৮), পৃ. ১

৩৬. হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য : গাজীর গান, (ঢাকা: সমাচার, একুশে বইমেলা ২০১৪), পৃ. ৩৫

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৬